স্মৃতিতে ছোট মামা

-শিরিন আফরোজ

আমাদের সবার প্রিয় ছোট মামা ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান আর এই পৃথিবীতে নেই। তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছায় পাড়ি দিলেন অনন্তর দুনিয়ায়, রেখে গেলেন অসংখ্য স্মৃতি।

কাছাকাছি বয়সী হওয়ায় শৈশব কৈশোরের অনেকটা সময় আমরা একসাথেই বন্ধুর মতো কাটিয়েছি। হাতির পুলের বাসার কাছাকাছি এবং আশে পাশে আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন ছিলেন বিধায় আমাদের ছিলো একটা বিরাট দল। মামাদের কাজিন ও আমাদের কাজিনরাও ছিল। কাজেই মামা ও সবাইকে নিয়ে সব সময় আনন্দময় পরিবেশে অনেক সময় কাটিয়েছি। মামা ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল ও আমোদ প্রিয়, মানুষকে ভালোবাসার অপরিসিম ক্ষমতা বিধাতা তাকে দিয়েছিলেন। কারো প্রতি রাগ, হিংসা, পিছনে লাগা, সমালোচনা করা, কাউকে ছোট করা, আঘাত দিয়ে কথা বলা বা কোন কিছুর প্রতি লোভ করতে অন্তত: আমি কখনো দেখিনি। কোন অশ্রাব্য বা অশালীন শব্দ উচ্চারণ করতেও আমি কখনও দেখিনি বা কারো কাছ থেকে অভিযোগ পাইনি। বরং সব সময়ই সবার উপকার করার চেষ্টা করতেন। এমনকি সেটা পড়ালেখা বা অন্য যেকোনো বিষয়েও। তাই সবার কাছেই তিনি খুবই প্রিয় ছিলেন।

মামা খুব ভালো ছবি আকঁতেন, গীটার বাজাতেন, সাহিত্য চর্চা করতেন। যে কোন ইনডোর খেলাধুলা সবকিছুতেই পারদর্শী ছিলেন। আমরা প্রায়ই মেজোমামার তত্বাবধানে সাহিত্যবাসর করতাম। যেখানে গান, কবিতা সবই হতো, মেজো মামার ছিল বইয়ের বিশাল ভান্ডার। মেজো মামা নিজেও সাহিত্য চর্চা করতেন, যার জন্য আমাদের বইপড়া ও সাহিত্য চর্চার অভ্যেস গড়ে উঠে। ছোট মামা বেশির ভাগ সাইন্স ফিকশন, কৌতুক ও রহস্য উপন্যাস পড়তেন; তার মধ্যে ছিল দস্যুমোহন, শার্লক হোম্‌স ইত্যাদি।

ছোট মামার প্রিয় খাবারের তালিকায় ছিল সবরকম টক, ঝাল। মিষ্টি মোটেও না। তার মধ্যে তেঁতুল অন্যতম। মামা তেঁতুলের সাথে একটু পানি, ভাজা শুকনো মরিচের গুড়া আর লবন দিয়ে একটা মিশ্রন তৈরী করতেন যেটা ছিলো আমাদেরও খুব প্রিয়। আমাদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য চামচ দিয়ে একটুখানি হাতে দিয়ে বলতেন ব্যস

আর না, এর বেশী খেলে তোমাদের ব্রেইন ডাল হয়ে যাবে। বলে আয়েস করে খেতে খেতে ছুটে যেতেন। আমরাও পিছন পিছন ঘুরতাম। এসব করতেন শুধুই মজা করার জন্য।

সবসময় আপনজনদের যেকোন কাজে সাহায্য করতে চাইতেন। তাই মা, বোন, ভাবীর গৃহস্থালী-কাজেও সাহায্য করতেন। সবাই অবশ্য না করতেন। মামা এগুলো করতেন শুধু কাজকে ভালোবেসে নয়, বরং আপনজনদের কষ্ট লাঘব করার জন্যই।

জ্ঞান পিয়াসী মামা ছোট বেলা থেকেই পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলা, এই নীতি মেনে চলতেন। পড়ালেখার ব্যাপারে কোন আপোষ করতেন না। খুবই মেধাবী ও অধ্যাবসায়ী ছিলেন বলে স্কুলে রেজাল্ট ভালো করতেন। প্রথম, দ্বিতীয় হওয়ার জন্য কখনও প্রতিযোগিতা করেননি। সেটা কোনো ব্যাপারেই নয়, সেজন্য অন্যান্য গুনাবলী প্রকাশ্যে আনার চেষ্টা করেননি। কোন কিছু নিয়ে অহংকার করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।

মামা খুবই পরিপাটি, গোছানো এবং সৌখিন ছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত পোষাক আশাক ও অন্যান্য ব্যাপারে খুবই সাদাসিদা ও বাহুল্যবর্জিত থাকতেন। কিন্তু ঘরবাড়ি সাজানোর সৌখিন জিনিসপত্র, পেইন্টিং কিনতে কোন কার্পন্য করতেন না। ছোটো বেলায় তিনি বলতেন, আমি যখন চাকরি করবো তখন অর্ধেক টাকা দিয়ে ঘর সাজাবো। তিনি বাগান করতেও খুব ভালোবাসতেন, গাছপালা পাখীদের সাথে ছিল তার নিবিড় সম্পর্ক।

বয়সে অনেকটা বড় হলেও মেজোমামার সাথে ছিল তার একটা আলাদা আত্মীক সম্পর্ক। মেজোমামা সমাজ সেবা করতেন। অনেক সময় অনেক কাজে হয়তো বাড়ী ফিরতে কিছুটা রাত হয়ে যেতো। ঐ সময় রাত ৮ টা মানে অনেক রাত। নানু ঘুমিয়ে পড়তেন, কারণ উঠতে হতো ভোর ৪টার আগে। ছোট মামা খাবার আগলে রাত জেগে থাকতেন মেজো মামা না আসা পর্যন্ত। নানু যাতে টের না পান সে জন্য সব কাজ করতেন চুপিচুপি। আমার তিন মামা এবং তাদের একমাত্র বড় বোন (আমার মা)। তাদের মধ্যে ছিল দৃঢ় বন্ধন। সৌহাদ্যপূর্ন সম্পর্ক ও আন্তরিকতা ছিলো নিখাদ। আমরা সব সময় মনে করি আমার মামারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্বায়িত্ববান, সৎ, নির্লোভ, পরিশ্রমী ও নিরহংকার। পরিবার, সমাজ ও আত্মীয় স্বজন সবার জন্য তারা সবসময় নিবেদিত প্রাণ । প্রয়োজনে নিঃস্বার্থ ভাবে সবার পাশে থাকার চেষ্টা করেন।

ছোট মামা খুবই চাপা স্বভাবের ছিলেন। নিজের কষ্টটা অন্যকে বুঝতে দিতে চাইতেননা। আমার নানা ভাই যখন মারা যান মামা তখন মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ক্লাস এইটের ছাত্র। এক সকালে নানাভাই ফজর নামাজ পড়ার সময় জায়নামাজেই স্ট্রোক করেন। তখন তিন মামার কেউই বাসায় ছিলেন না। বড় মামা ও মেজোমামা ছিলেন করাচিতে। পাশের বাসায় নানুর ভাইয়ের ছেলেরা নানাভাইকে হসপিটালে নিয়ে যান। কিন্তু চারদিন কোমায় থাকার পর নানা জান্নাতবাসী হন। আমার আব্বা ছোটমামাকে ক্যাডেট কলেজ থেকে নিয়ে আসেন। সেদিন আঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। সদ্য পিতৃহারা এক বালকের অন্তরে কি পরিমান কষ্টের পাহাড় জমেছিলো তা সহজে অনুমেয়। হঠাৎ দেখি ছোট মামা আড়ালে এক কোনায় দাড়িয়ে দুইহাত সামনে রেখে নীরবে কেঁদে যাচ্ছেন। বৃষ্টির পানি আর মামার চোখের পানি এক হয়ে যাচ্ছিল। আমি সামনে যাওয়ার পর আর সামলাতে না পেরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজোমামা কাউকে কিছু না বলে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ছোট মামাকে নানু চোখে চোখে রাখতেন। নানুর কথা ভেবে উনি রনাঙ্গনে না গেলেও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে সামিল হন। মেজোমামা পরে ছোট মামার সাথে যোগাযোগ করেন। ছোট মামার মারফত খবরাখবর সংগ্রহ করতেন। তিনি তখন মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি, ছোট মামা আর আমার ছোটবোন শাহিন তখন হস্তরেখা, ভাগ্য গননা এসব বিষয়ে খুব চর্চা করতাম। তখন কিরোর বই খুব জনপ্রিয় ছিলো। ছোট মামা যখন হাঙ্গেরি সরকারের স্কলারশিপের জন্য Apply করেন তখন আমরা Magnifying glass নিয়ে মামার হস্তরেখা বিশ্লেষন করে কোন Foreign line খুঁজে পাইনি। প্রতিদিনই খুজতাম আর কিরোর বইয়ের সাথে মিলাতাম। একসময় মামা হতাশ হয়ে বললো "আমার আর বিদেশ যাওয়া হবেনা"। পরে Foreign line ছাড়াই মামা Scholarship এর জন্য সিলেক্ট হলেন। তখনতো ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিল না। চিঠিই একমাত্র ভরসা। তাই সুন্দর সুন্দর চিঠির মাধ্যমে মামা তার প্রবাস জীবনের কথা শেয়ার করতেন।

১৯৭৫ সালে মামা বুদাপেস্ট থেকে ঢাকায় এলেন। Scholarship এর টাকা বাঁচিয়ে মামা সবার জন্য প্রচুর উপহার নিয়ে এসেছিলেন। মামা ঢাকায় আসছেন এতেই আমরা খুব খুশী। তার সাথে এতো উপহার। এ উপহার কিনতে হয়তো কতো কষ্ট করতে হয়েছে। অথচ মামার জন্য যখন কিছু কিনতে যাই মামা সব সময়ই না না করে উঠেন। আব্বা আম্মা মামাকে আরেক সন্তান হিসাবেই দেখতেন। আব্বা বললেন তোমার মামা তো নিজে থেকেই নিজের জন্য কিছু কিনতে চায়না। তোমরা সাথে গিয়ে ওর সব জিনিস কিনে দাও। আমি, শাহিন আর

মামা নিউমার্কেট ঘুরে ঘুরে মামার সব বন্ধুদের জন্য উপহার কিনলাম। টক, ঝাল, ফুচকা খেলাম। কিন্তু নিজের জন্য সহজে কিছু কিনতে চাননা। মামা সবসময়ই এমন ছিলেন। সবার চিন্তা করতেন শুধু নিজের চিন্তা ছাড়া।

কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে মামা সবসময় আমাদের সাবধান করতেন। ঘর থেকে যাতে না বের হই ও আরো অনেক সুরক্ষামুলক সাবধান বানী দিতেন। বিশেষ করে পিতৃতুল্য বড় মামা আর মামির জন্য সবসময় দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠিত থাকতেন। ঘরে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেন বড় মামা। নভেম্বর ২০২০ এ কক্সবাজার যাওয়ার ঘোষনা দিলেন তিনি। ছোট মামা হাহাকার করে উঠলেন। বড় মামা বললেন আল্লাহ ভরসা। আমরা সবাই গেলাম, বড় মামা যে হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা। অসাধারণ নেতৃত্বগুন তাকে করেছে সবার চাইতে আলাদা। উনার ডাককে অগ্রাহ্য করার সাধ্য আমাদের কারো নেই। আলহামদুলিল্লাহ, আমার ৮৫ বছরের বড় মামা ৩০ জনের দল নিয়ে কক্সবাজার দাপিয়ে ঢাকায় ফিরে এলেন সুস্থ অবস্থায়। এরপর ফেব্রুয়ারী ২০২১, আবার গেলাম বড় মামার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ী জামালপুরে ৪০ জনের বিশাল বহর নিয়ে। তখন ছোট মামা একদম মুষড়ে পড়লেন। মিনিসোটা থেকে পারলে ছুটে এসে বাধা দেন। আমরা আল্লাহর মেহেরবানীতে সবাই এখনো সুস্থ আছি। কিন্তু আমাদের নিয়ে যার এতো উৎকণ্ঠা এতো দুঃচিন্তা তিনিই চলেন গেলেন সবার আগে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে।

মামারা (ছোট মামা, মামী আর তাহিন, মামার একমাত্র ছেলে) যখন ঢাকায় আসার প্রোগ্রাম করতেন, আমরা সবাই দিন গুনতাম, কারণ মামা যে সবার প্রিয়। আমাদের ততদিনে পরিবারে আরো অনেক সদস্য যোগ হয়েছে। পরের প্রজন্মের ছোট বড় সবার কাছেই তিনি কারো প্রিয় মামা, চাচা, দাদা বা নানা । যে কয়দিন ঢাকায় থাকতেন, মামার আনন্দময় ও প্রানবন্ত উপস্থিতি সবাই উপভোগ করতো। ছোট মামা-মামী ও বড় মামার ছেলে মেয়ের পরিবার, মেজো মামার পরিবার (মেজো মামা ২০১৪ সালে জান্নাতবাসী হয়েছেন) আমাদের ভাই বোনের পরিবার, আমাদের এতোবড় পরিবারের সবাই আমরা বেশিরভাগ সময় একসাথেই কাটাতাম। বড় মামার বাসায় ছোট মামার জন্য আলাদা রুম আছে। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি সবাই ঐখানেই প্রথমে মিলিত হই। এরপর যে কদিন মামারা ঢাকায় থাকতেন তাদের ব্যক্তিগত কাজ ছাড়া সবাই একসাথেই বেড়াতাম। ওই কয়দিন সবার মধ্যে যা আনন্দ থাকতো, তাতে ঈদ এর আনন্দও ম্লান হয়ে যেত। এরপর সবাই থাকবে মামা আর আসবেন না। আর মামার সদা হাস্যময় মুখটা দেখবনা। একথা মানতেই পারছিনা। সবকিছু কেমন শূন্যতায় ভরে গেলো।

জানি এটাই সত্য। প্রত্যেকটা মানুষের জন্য মৃত্যু অবধারিত। শুধু কার কতটুকু হায়াত সেটা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ জানেন। পরম করুনাময় আল্লাহ পাক, তিনি তার প্রিয় বান্দা, আমার ছোট মামাকে তার কাছে নিয়ে গেছেন। নিশ্চয়ই তিনি এই রমজান মাসের উছিলায় তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে ঠাঁই দিবেন। তার কবরের আজাব মাফ করে দিবেন। আর মামার শোকাহত পরিবারকে এই অপুরনীয় শোককে সহ্য করার শক্তি দান করবেন। **আমিন।** আল্লাহ মেহেরবান আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুন, হেফাজত করুন। ঈমানের সাথে রাখুন এবং ঈমানের সাথে যেন মৃত্যুবরণ করতে পারি সেই প্রার্থনাই করি। **আমিন।**